উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তাকাঠামোয় সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব*

নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা*

সারসংক্ষেপ : বাংলা নাট্যধারায় সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)-এর প্রথম দুটি নাটক কালবেলা (১৯৬২) ও মাইলপোস্ট (১৯৬৫)-এর মধ্য দিয়ে সূচিত হয় অ্যাবসার্ড ধারার নাট্যচর্চা। মোট পাঁচটি নাটকের মধ্যে জীবনের শেষ অঙ্কে রচিত তাঁর শেষ নাটক *শেষ নবাব* (১৯৮৮) নানাগুণে বিশিষ্ট। অ্যাবসার্ড ধারা থেকে বেরিয়ে তিনি এখানে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নাটকের বিষয় করে নিয়েছেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার স্বল্পকালস্থায়ী শাসনকাল এবং পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের ঘটনা এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্তমান প্রবন্ধে সেদিকটি বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হবে।

সুদীর্ঘকালের প্রচার ও অপপ্রচারের ধুলো ঝেড়ে সাঈদ আহমদ তাঁর *শেষ নবাব* নাটকে ইতিহাসের একটি চরম সঙ্কটময় কালকে তুলে এনেছেন । একজন নিষ্ঠাবান গবেষকের মতো শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং প্রতিটি চরিত্রকে সত্যিকার রূপে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন তিনি। এটি সেই সময়কার কথা যখন সম্পদশালী ভারতবর্ষে একচ্ছত্র বাণিজ্য করার সোনার চাবি পাওয়ার লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল ইউরোপের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও ফরাসি বেনিয়াগোষ্ঠী। উভয়েই চেয়েছিল অনুগত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য নিরঙ্কুশ ও অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ তৈরি করতে। ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ সুবে বাংলার দিকে শ্যেনদৃষ্টি ছিল দ্বন্দ্বরত উভয় পক্ষেরই। মোগল শাসনের ক্ষয়িষ্ণু কালে রাজধানী দিল্লিসহ বিভিন্ন প্রদেশে দুর্বল শাসনব্যবস্থা, শাসক ও আমির ওমরাহদের উৎকোচপ্রীতি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ অপরাজনীতি, ক্ষমতার মোহদুষ্ট দুর্বল ও আনুগত্যহীন সামরিক বাহিনি রচনা করে উপনিবেশায়নের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.3

অনুকূল পরিপ্রেক্ষিত। নবাব আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে অভিষিক্ত তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলা শুরু থেকেই ঘরে-বাইরে ভয়াবহ চক্রান্ত ও বিরোধিতার মুখোমুখি হন । তাঁর খালা, প্রধান সেনাপতি, রাজকর্মচারী, দেশীয় বণিক এবং বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা সকলে মিলে নবাবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যায় সমৃদ্ধ হয়েও নবাব-বাহিনি পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত ইতিহাসের ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতামূলক পরিহাসের যুদ্ধে হেরে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্নেল ক্লাইভের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র ও সৈন্যের কাছে। দীর্ঘকালের জন্য বাংলা এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ চলে যায় উপনিবেশের কৃষ্ণগহ্বরে। ইতিহাসের এই সত্যঘটনাই হয়ে উঠেছে সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* নাটকের উপজীব্য।

নাটকটি রচনা করতে সাঈদ আহমদ সময় নিয়েছেন প্রায় দশ বছর (১৯৭৮-৮৮)। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেশে এবং বিদেশে এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত ও গভীর গবেষণা করেছেন । নাটকের ভূমিকায় সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তিনি,

> লেখার মাঝে মাঝে আমার সুযোগ হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নবাব সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি দেশি-বিদেশি বই, গবেষণাপত্র, দলিলাদি পড়ার। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোলকাতা, মাদ্রাজের পুরোনো সেক্রেটেরিয়েট অফিসে গিয়ে বিভিন্ন দলিলপত্র দেখেছি। ব্রিটেনেও গবেষণার কাজ চালিয়েছি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। পেয়েছি অনেক চমকপ্রদ তথ্যাদি। (সাঈদ, ২০১২ : ৬৪৯)

নাটক রচনার এই প্রলম্বিত কাল সম্পর্কে শামসুর রাহমান আলোচ্য নাটকের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন,

> যে বিষয় নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন সেনগুপ্তের মতো নন্দিত নাট্যকার লেখনী চালনা করেছেন, সে বিষয় অবলম্বনে নতুন করে নাটক লেখা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সাঈদ আহমদ আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল নাট্যকার।...প্রশ্ন উঠতে পারে, 'শেষ নবাব' রচনা করতে এত সময় কেন লাগল? আমরা জানি, সৃষ্টির প্রক্রিয়া রহস্যময়। কোনো কোনো লেখা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, আবার কোনো কোনো রচনার পেছনে ব্যয়িত হয় দীর্ঘ সময়।" (সাঈদ, ২০১২ : ৬৪৭)

তবে নাটকটি রচনা করতে দশককাল ব্যয় করলেও সাঈদের শিল্পিমানসে এই নাটকের ভাবনাবীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আরো অনেককাল আগেই। বিশেষত চরিত্র হিসেবে সিরাজদ্দৌলা যে তাঁর আকৈশোর এক প্রেরণার উৎস ছিলেন তার সন্ধান মেলে তাঁর ক্ষুদ্র একটি গদ্য রচনায়। "সিরাজদ্দৌলা পার্ক" শিরোনামে একটি লেখায় তিনি কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন – বৃটিশ শাসনাধীন পুরানো ঢাকায় একটি পার্ক করার উদ্যোগ নেয়া হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত নেন পার্কটির নাম রাখা হবে সিরাজদ্দৌলা পার্ক। কিন্তু এতে বাধ সাধে তৎকালীন

প্রশাসন। ততোধিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্থানীয় লোকজন। প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষ একাত্ম হয়ে পার্কের নামফলক উদ্বোধন করেন। সাঈদ আহমদের কথায়–

> আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমিও গেলাম সমাবেশে। ইসলামপুর, নয়াবাজার, আশেক লেন, বেগম বাজার, হোসেনী দালান থেকে দলে দলে লোক জড়ো হলো। উদাত্ত কণ্ঠে সিরাজদ্দৌলার নাম উচ্চারিত হলো। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সবাই সমস্বরে স্লোগান দিল। এ এক অভূতপূর্ব পরিবেশ। সবার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার।
>
> সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে আমি একটি নাটক লিখেছি, নাম 'শেষ নবাব'। নাটকটি লেখা শুরু করেছি ১৯৮৭ সালে, শেষ করি ১৯৯৮ সালে। 'শেষ নবাব' রচনাকালের ব্যাপ্তিই বলে দেয় সিরাজদ্দৌলা কতটা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে। সিরাজদ্দৌলা জিন্দাবাদ। (সাঈদ, ২০১২: ৩৫৯)

নাট্যকারের শিল্পিচৈতন্যে সিরাজদ্দৌলার প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক তা তাঁর এই উক্তিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুই.

নাটকের প্রথম অঙ্ক শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদের চরম দুঃসময়কে কেন্দ্র করে। তখন সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ছিল চরম পর্যায়ে। অর্থ ও ক্ষমতার মোহ চতুর্দিকে তার কালো থাবা বিস্তৃত করে রেখেছিল। কেন্দ্রে ও প্রান্তে মোগল শাসনের প্রশাসনিক কাঠামো হয়ে পড়েছিল ভঙ্গুর ও বিপর্যস্ত। বিদেশি বেনিয়ারা তাদের অনিঃশেষ লোভ চরিতার্থ করতে ভারতবর্ষের এই নৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ পুরোটাই কাজে লাগাতে ছিল বদ্ধপরিকর, সচেষ্ট ও সক্রিয়।

মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পর থেকেই আপন খালা ঘসেটি বেগমের তীব্র রোষানলে পড়েন সিরাজদ্দৌলা; একই সঙ্গে তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের আস্থা ও আনুগত্যও অর্জনেও ব্যর্থ হন তিনি। নাটকের সূচনায় নবাবমাতার জ্যেষ্ঠ সহোদরা ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদে রাজবল্লভ, মীরজাফর আলী খান, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখের জড়ো হবার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, একইসঙ্গে নবাবকে সিংহাসন থেকে উৎখাতের জন্য তাদের সম্মিলিত চক্রান্ত সেই সময়কার রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রও তুলে ধরে। ত্রিশ বর্ষীয় তরুণ নবাব গুরুতর প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও ঘোরতর চক্রান্তের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। প্রথম অঙ্কের ঘটনাদৃশ্যে একে একে উন্মোচিত হয় রাজবল্লভ, মীর জাফর আলী খান, জগৎশেঠ এবং ঘসেটি বেগমের চরিত্রের স্বরূপ। রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের স্বামী প্রয়াত নবাব নওয়াজীশ আলী খানের অনুগত রাজকর্মচারী, যার কাজ

ছিল ঢাকার নিরীহ প্রজাসাধারণদের শোষণ ও লুণ্ঠন করে সেই লুণ্ঠিত অর্থের অংশ মুর্শিদাবাদে ঘসেটি বেগমের কাছে পাচার করা এবং নিজ পুত্রের কাছে অবশিষ্ট অর্থ গচ্ছিত রাখা। ঘসেটি বেগমের মতিঝিলের প্রাসাদ সেই লুণ্ঠন ও নির্লজ্জতার নিদর্শন। জগৎশেঠ পাঞ্জাব মুলুক থেকে তেজারতির ব্যবসা করতে মুর্শিদাবাদে এসে ধনকুবের হয়েছে। সিরাজ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় সেও বিপুল অর্থ ঢেলে নবাবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বোপরি মীর জাফর আলী খান– যিনি নবাব আলীবর্দ্দীর সিপাহসালার, মৃত্যুর প্রাকপর্যায়ে আলীবর্দ্দী খান পৌত্র সিরাজদ্দৌলাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার দায়িত্ব যার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনিও সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে সামিল হন। নাট্যকার এক্ষেত্রে সিরাজের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী প্রতিটি চরিত্রের এই দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতার কারণ উদ্ঘাটন করেছেন। নাট্যসূত্রে জানা যায়, মীরজাফর একদা আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিলেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্তও হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে অনভিজাত ব্যক্তিদের পদায়নে সিরাজের অসন্তুষ্টিএবং বিভিন্ন সময়ে নবাবকর্তৃক নানা কটুবাক্য তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। সর্বোপরি মসনদের প্রতি ছিল তার গভীর গোপন অভিলাষ। ফলে তরুণ নবাবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মীর জাফর। অন্যদিকে ঘসেটি বেগম ছিলেন নবাব আলীবর্দ্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা। নিঃসন্তান, রূপবতী, মেধাবী, বিচক্ষণ ও আত্মসচেতন ঘসেটি বেগম নিজেকেই সিংহাসনের যৌক্তিক দাবিদার মনে করে আসছিলেন বরাবর। কিন্তু পিতা আলীবর্দ্দী প্রচলিত সকল নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচিত করায় তিনি ক্ষিপ্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর স্বার্থান্ধতা তাঁকে আপন ভাগনের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করে। তাঁর প্রাসাদেই সকল ষড়যন্ত্রকারী সম্মিলিত হয় সিরাজদ্দৌলার উৎখাত-পরিকল্পনা রূপায়ণে – "সিপাহসালারের রণ-কৌশল, বেগম সাহেবার কূটনীতি, রাজবল্লভের গুপ্তচর গোষ্ঠী আর ধনকুবের জগৎশেঠের পয়সা কড়ি যদি কোনোক্রমে একজোট হতে পারে তবে এদেশের ভাগ্য একেবারে পাল্টে যাবে।"[১] (সাঈদ, ২০১২: ১২৫) তবে অকস্মাৎ মতিঝিল প্রাসাদে সিরাজের আগমন এবং চক্রান্তকারীদের উপস্থিতিতেই ঘসেটি বেগমকে হীরাঝিলে নবাবের প্রাসাদে অবরুদ্ধ করে তাঁর কোষাগার জব্দ করার মধ্য দিয়ে পারিবারিক ষড়যন্ত্রের আপাত-সমাপ্তি ঘটলেও অমাত্যবর্গের কূটচাল তখনও অব্যাহত থাকে।

প্রথম অঙ্কে নাট্যকার আরো একটি বিশেষ দিক পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেন। নবাব সম্পর্কে বহুকাল ধরে একটি কথা বহুল প্রচারিত ছিল যে তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। বস্তুত তা যে নিছক অপপ্রচার তা সিরাজের উক্তিতেই তুলে ধরেন নাট্যকার, "...রাণী ভবানীর দুহিতার সঙ্গে বা নাচনেওয়ালী ফৈজীর ব্যাপারে যে সব খবর শুনেছেন সেগুলো ডাহা মিথ্যা। কিছু কিছু সভাসদ

এবং ইংরেজ সুহৃদ আমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার জন্য অপবাদ ছড়াচ্ছেন।"(সাঈদ, ২০১২ : ১২৯) এ নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে দেখা যায় মেধাবী রাজনীতিকের ভূমিকায়, দেশপ্রেমিক শাসক রূপে, দায়িত্বসচেতন ও বিচক্ষণ প্রধান নির্বাহীর ভূমিকায়। তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃত সঙ্কট সম্পর্কে জ্ঞাত ও উদ্বিগ্ন। দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশেষত উচ্চপদস্থ সভাসদ ও আমির উমরাহ অমাত্যবর্গের অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সার চোরাগলি দিয়ে ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায় সেই দিকটি তাঁর কাছে স্পষ্ট। এই সঙ্কট মোকাবেলায় যে ত্বরিৎ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এবং এই কাজে সবচেয়ে বড় বাধা যে নিজেদের মধ্যে একতার অভাব সেটিও তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। তাই প্রাথমিকভাবে অন্তর্ঘাত প্রতিরোধ করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তিতে সিরাজদ্দৌলার উক্তি তারই সাক্ষ্য বহন করে –

> মুর্শিদাবাদকে সহজ, সরল, স্বাভাবিক করতে হবে। শান্তি আমাদের চাই। ..বামে কর্নেল ক্লাইভ, মাঝখানে সিরাজদ্দৌলা এবং ডাইনে ঘসেটি বেগম। সবার লক্ষ্য – বাংলার তখ্ত। ক্লাইভ এই দেশের সবচেয়ে দুর্বল স্নায়ুর সন্ধান পেয়ে গেছে। টাকার লোভ সামলাতে পারে এমন লোক আমার রাজ্যে বোধহয় আর বেশি নেই। ...দিল্লীর সুলতান এরই মধ্যে অজস্র টাকা নিয়েছেন আর যাকে তাকে সনদ দিয়েছেন। সেই পথ অনুসরণ করতে আমাকে অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু আমি করব না। ...বাংলাদেশে বিদেশীদের চোখরাঙানী সহ্য করব না। যদি কেউ ইজ্জত খর্ব করতে চায়, তাহলে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেবো। কিন্তু একি সম্ভব? আমার রাজ্যে একতার দুর্ভিক্ষ। প্রত্যেকেই নিজেকে এক একজন ক্ষুদে নবাব মনে করেন এবং বড় নবাব হবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী রাখা, রাজবল্লভকে কৃষ্ণদাসের লুট করা টাকা থেকে বঞ্চিত করা এবং মীরজাফরকে সঙ্গীহীন করাই আমার লক্ষ্য। (সাঈদ, ২০১২ : ১৩২)

আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কটিও তাৎপর্যময় ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি হিসেবে সর্বদাই গণ্য হবে কেননা এখানেই নাট্যকার তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ তথ্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য ও চারিত্র্য, বিশেষত ক্লাইভ চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ সমৃদ্ধ করেছে নাটকটিকে। শত শত বছর ধরে পশ্চিমারা তাদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন আর নির্মমতার হীন ও জঘন্য কাজগুলিকে যে মিথ্যার প্রলেপে ঢেকে রেখেছিল নিজেদের তথাকথিত উন্নত সভ্যতার মুখোশে, সেই বিন্ধ্যাচল ভেঙে সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরার নতুন যে উদ্যম উত্তর-উপনিবেশবাদী বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে তারই প্রতিফলন সাঈদের এই নাটকে সুপ্রত্যক্ষ। নাটকপাঠে জানা যায়, সেই সময়কার ইংল্যান্ডের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তনের পটভূমি সম্পর্কে। ১৫৯৯ সনের ২৪ শে সেপ্টেম্বর লন্ডনের একটি জীর্ণ বাড়িতে ২৪ জন ব্যবসায়ী একত্র হয়েছিলেন ডাচদের আচমকা গোলমরিচের দাম ৫শিলিং বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা হাতিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।

তারপর লিডেনহিল স্ট্রিটের একটি ভবনে ৭২০০০ হাজার পাউন্ড মূলধন আর ১২৫ জন শেয়ারহোল্ডারের একনিষ্ঠতায় আরম্ভ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানির যাত্রা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেদার মুনাফা আর প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিদের নিপাত করা। সেই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর মহারানী এলিজাবেথ এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করে এই কোম্পানিকে ১৫ বছরের জন্য একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার প্রদান করেন। একবছর পর "দুর্ধর্ষ জলদস্যু" ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স পাঠান দস্যুদের সহায়তায় Hector জাহাজ নিয়ে ভারতের সুরাট বন্দরে নোঙর ফেলে। ইতোমধ্যে ভারতে ইউরোপের প্রতিযোগী অন্যান্য বণিকেরাও ভারতে ব্যবসা শুরু করে। ধূর্ত হকিন্স সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় আগ্রায় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে। তিনি ছিলেন তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাদশাহ এবং যাঁর প্রতিপত্তির কাছে ইংল্যান্ডের রানীর অবস্থান ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সম্রাটকে তুষ্ট করে হকিন্স আদায় করে নেয় বম্বের বন্দরে ব্যবসা কেন্দ্র খোলার ছাড়পত্র। তারপর থেকে ভারতের বন্দরে একে একে অনেক জাহাজ নোঙর ফেলতে শুরু করে। কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দুই কর্মকর্তার উক্তিতে উদ্ঘাটিত হয়সেই সত্য –

> ...মাদ্রাজের সৈকত, Bengal-এর উপকূলে ঘটলো অগণিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী আর সিপাহীর সমাবেশ।
>
> একশ গুণ এমন কি দু'শ গুণ মুনাফায় আমাদের পণ্য বিক্রি হতে লাগলো, আর, ওদের গুলো পানির দামে কিনে London পাঠানোর হিড়িক পড়ে গেলো। কোম্পানীর shareholder রা টাকার পাহাড় তৈরি করতে লাগলেন। (সাঈদ, ২০১২ : ৪৩)

তৎকালীন ভারতবর্ষ তাদের কাছে ছিল এক রূপকথার দেশ – "সেখানে পায়রার ডিমের মতো বড় বড় পদ্মরাগ মণির লালিমা, জাফরান আর দারুচিনির সুগন্ধ মনকে মাতাল করে তোলে। মসলিনের মসৃণ পেলব রমণীদের উচ্ছৃঙ্খল করে ফেলে। সে তো যাদুর দেশ। রূপকথার দেশ।" (সাঈদ, ২০১২ : ১৪৩)

অন্যদিকে লন্ডন ছিল বস্তি আর দারিদ্র্যের এক শহর। দরিদ্রঘরের সন্তানেরা অর্থাভাবে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। আইনশৃঙ্খলাবাহিনী কেবল বড়লোকের নিরাপত্তার জন্যই ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে দীর্ণ এক দীন ইংল্যান্ডই ছিল তখনকার বাস্তবতা। অথচ ধন-দৌলতে ভরা ভারতবর্ষে তখন স্বপ্ন আর বাস্তবতার পার্থক্য নিরূপণ করা ছিল দুষ্কর – " ধন-দৌলত সে দেশ থেকে সারা জীবন শোষণ করলেও শেষ হবে না। শুনেছি সেখানকার dream আর reality-র পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বড় বড় scholarরা হিমশিম খেয়ে গেছেন।" (সাঈদ, ২০১২ : ১৪৩)

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাস্থল পলাশীর ময়দানের ইংরেজ শিবির, সময় ২২ জুন রাত্রিবেলা। আসন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে কর্নেল ক্লাইভ ও তার সহকর্মীদ্বয়ের কথোপকথন থেকে জানা যায় – তারা এদেশে ব্যবসা করতে আসলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল আরো বড়োকিছু, অর্থাৎ ক্ষমতাদখল। ক্লাইভের উক্তিতে তা হয়ে ওঠে স্পষ্ট। সে সহকর্মী কুট-এর প্রশ্নের উত্তরে সে বলে,

> রাজ-দরবারে চক্রান্ত আর আমলাদের মধ্যে ঘুষের অগণিত বিষবৃক্ষরোপণ করতে অনেক বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। শত্রুর আত্মবিশ্বাসকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য ভয়াবহ গুজবের হাজারো বুলেট চারদিক থেকে ছুঁড়েছি। এ গুলো মারাত্মক অস্ত্র। শত শত সেপাই থেকেও বেশি dangerous. (সাঈদ, ২০১২: ১৩৬)

পলাশীর যুদ্ধে অস্ত্র-গোলাবারুদ, সৈন্যসংখ্যা এবং পরিবেশ ও আবহাওয়া সকল দিক থেকেই তাদের অবস্থান নবাবের তুলনায় ছিল একেবারেই নগণ্য ও প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও তারা এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল ক্লাইভের ভাষায় – "এ যুদ্ধ জটিল ষড়যন্ত্রের যুদ্ধ, এ যুদ্ধ উৎকোচের যুদ্ধ, প্রতারক আর অবাঞ্ছিতদের যুদ্ধ, এ যুদ্ধ অভাগাদের যুদ্ধ।" (সাঈদ, ২০১২: ১৩৬) ক্লাইভের সহকর্মী কুট ও কিলপ্যাট্রিক এই যুদ্ধকে "পাপের যুদ্ধ" এবং "unjust war" বলে মনে করে। কুটের অত্যন্ত যৌক্তিক ও যথোচিত অভিমত ছিল "একজন সভ্য মানুষ হিসেবে যে দেশে আছি, যাদের সঙ্গে বসবাস করছি ওদের আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য। আমরা তেজারত করতে এসেছি। Law of Inheritance সংশোধন করতে আসিনি।" (সাঈদ, ২০১২: ১৩৭) কিন্তু একগুঁয়ে এবং উচ্ছৃঙ্খল ও ঝগড়াটে স্বভাবের ক্লাইভ তুচ্ছ অজুহাত ও যুক্তিতে বাংলার নবাবকে উৎখাত করার এই ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাই সিরাজদ্দৌলাকে সে কখনও "স্বেচ্ছাচারী নবাব", কখনো "লম্পট নবাব" বলে অভিহিত করে এবং তাকে "উপযুক্ত শিক্ষা দিতে" বাংলার মসনদ থেকে উৎখাত করে "স্বাধীনচেতা" ঘসেটি বেগমের পরিবর্তে মীরজাফরকেই নবাব বানানোর জন্য মনস্থির করে। যদিও এই দুরভিসন্ধিমূলক কাজে ক্লাইভ ও তার সঙ্গীদের অংশগ্রহণের প্রকৃত কারণ ছিল অন্যত্র। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়দের মধ্যে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বহু পুরানো। এদিকে ফরাসিদের সঙ্গে ছিল নবাবের সুসম্পর্ক, নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীকে পাশ্চাত্য রণকৌশলে প্রশিক্ষিত করার মূল দায়িত্ব ও কৃতিত্ব ছিল ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের। অন্যদিকে ক্লাইভের উক্তি অনুযায়ী, "দিল্লীর বাদশাহ কয়েক লাখ টাকা নিয়ে আমাদের সনদ দিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য, আপনাকেও কয়েক লাখ টাকা দিচ্ছি। কিন্তু নবাব ঘুষ নিতে নারাজ। বোধহয় দেখাতে চান যে দিল্লীর বাদশাহের চেয়েও বাংলার নবাব অনেক বেশি ঈমানদার।" (সাঈদ, ২০১২: ১৩৮) তাই ক্লাইভ ও তার অনুসারীরা তাদের স্বার্থ ও অনিঃশেষ লোভ চরিতার্থ করতে

সিরাজদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ থেকে এবং ফরাসিদের ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়।

এদেশীয়দের সম্পর্কে ক্লাইভের ধারণা ছিল একপেশে ও কলোনাইজারদের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। তার কিছু উক্তিতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন এক জায়গায় সে বলছে, "দল পাকাতে এরা ওস্তাদ। চক্রান্ত করতে এরা সিদ্ধহস্ত। আশ্চর্য ব্যাপার প্যাট্রিক, এরা অনেক ক্ষেত্রে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে। বাইরের চক্রান্তে নিজের ঘরে আগুন লাগানোর অভ্যেস এদের অনেক দিনের পুরোনো।" (সাঈদ, ২০১২: ১৩৭) কিংবা "সিরাজ একজন স্বেচ্ছাচারী নবাব। ইংরেজের moral code অনুযায়ী এই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির সিংহাসন দখল করে রাখার কোনো অধিকার নেই।" এবং "শান্তি নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে কেবল ইংরেজই সক্ষম। কালা আদমী আগুন লাগাতে জানে নেভাতে জানে না।" প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্লাইভের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কলোনিয়াল ডিসকোর্স। বস্তুত, কলোনাইজাররা এভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে, কিংবা প্রাচ্যবাসীরা স্বশাসনের যোগ্যতা রাখে না এই ছুতোয় এবং "কালা আদমীদের" সভ্য বানানোর "নৈতিক দায়িত্বের" নামে সম্পদশালী আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে তাদের হিংস্র ও লোভী থাবা মেলে ধরেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত চিন্তাজগতে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) গ্রন্থের কথা। তাঁর এই গ্রন্থের প্রভাবে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে পোস্টকলোনিয়াল স্টাডিজ নামে নতুনতর জ্ঞানের চর্চা। ঐ গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

> The most important thing about the theory during the first decade of twentieth century was that it worked, and worked staggeringly well. The argument, when reduced to it's simplest form, was clear, it was precise, it was easy to grasp. There are Westerners, and there are Orientals. The former dominate; the latter must be dominated, which usually means having their land occupied, their internal affairs rigidly controlled, their blood and treasure put at the disposal of one or another Western power. (Said, 1979 : 36)

বলাই বাহুল্য, প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এই ধারণা ছিল একপেশে। প্রকৃত সত্যটি নাট্যকার অত্যন্ত চমৎকারভাবে কুটের উক্তিতে তুলে এনেছেন,

> কিন্তু আমি জানি বাংলার ইতিহাসে এর ঠিক উল্টো ভুরি ভুরি example-ও আছে। এই সুবে বাংলার অনেক বীর যোদ্ধার কাহিনি আমি নিজে লিপিবদ্ধ করেছি। অনেক বিদেশী জালিমকে এরাই নিজের বাহুবলে সাজা দিয়েছে, তাড়িয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েছে। (সাঈদ, ২০১২ : ১৩৭)

প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিই হচ্ছে কাউন্টার ডিসকোর্স, যা কলোনাইজারদের প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সকে চ্যালেঞ্জ করে প্রকৃত সত্যকে এবং পুরো সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই এই নাটকের প্রথম অঙ্কে নবাব সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে ক্লাইভ যখন বলে, "যে বাদশাহ খবর রাখে না তার আশেপাশে কি ধরনের চক্রান্ত দানা বাঁধছে, কে কার দলিলে জাল দস্তখত করছে, কার সৈন্য সামন্ত কোন জায়গায়, চাষী-মজুরের কী অবস্থা, জনগণ কী বলছে, সেই রাষ্ট্র-নায়কের দেশ চালাবার কোনো অধিকার নেই। He has failed completely।" (সাঈদ, ২০১২ : ১৩৯) তখন এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। কেননা সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ঊনতা সত্ত্বেও প্রজার প্রতি দরদ ও দায়িত্ববোধ, দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আত্মীয় ও পারিষদের চক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ত্বরিৎ ব্যবস্থাগ্রহণ, দেশি-বিদেশি শত্রু-মিত্র চিহ্নায়ন এবং সর্বোপরি সিংহাসনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন ইত্যাকার সব বিষয়েই তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা পরিদৃষ্ট হয়। মাতামহের প্রিয়ভাজন হতে পেরেছিলেন তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও মেধার গুণেই, সেই দিকটিও স্মরণ রাখা জরুরি।

রবার্ট ক্লাইভের সত্যিকার পরিচয় উদ্ঘাটন এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। নাট্যকার এই অঙ্কে তুলে এনেছেন নিঃস্ব, হতদরিদ্র ঘরের সন্তান, বস্তিবাসী এক উচ্চাভিলাষী ভাগ্যান্বেষী তরুণ ক্লাইভকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ওমর বেগের জবানিতে পলাশীর যুদ্ধকে ঘিরে মীর জাফর আলী খানের রচিত প্রকৃত ষড়যন্ত্রের ছক তথা নীল নকশার বিবরণ। যুদ্ধের পূর্বরাত্রে ইংরেজ শিবিরে মীর জাফরের সর্বশেষ বার্তা নিয়ে এসে উৎকণ্ঠিত ক্লাইভ ও তার সহকর্মীদের আশ্বস্ত করে যায় ওমর বেগ। পাঠক অবগত হয় মীর জাফর আলী খান ও ক্লাইভের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে। পলাশীর যুদ্ধের তিন মাস পূর্বে ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্লাইভের স্বাক্ষরিত চুক্তির দলিল পাঠানো হয় মীর জাফরের কাছে। দলিলে লিখিত সকল শর্তের নানা দিক বিচার বিশ্লেষণ করে ৬ই জুন মীর জাফর তাতে স্বাক্ষর করে ক্লাইভের নিকট পাঠিয়ে দেন। ক্লাইভ ও ওমর বেগের সংলাপে প্রকাশিত হয় গোপন এই চুক্তির শর্তাবলি,

> "সর্বাগ্রে ফরাসীদের বাংগাল মুল্লুক থেকে লোটা কম্বল সমেত বের করে দেবেন। তাদের নাম গন্ধও যেনো বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে না পাওয়া যায়। এক কোটি টাকা company-কে ক্ষতিপূরণ দেবেন। ...
>
> "কোলকাতায় ইংরেজ বাসিন্দাদের জন্য পঞ্চাশ লাখ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য বিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত। চতুর্থ, আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সাত লাখ টাকা দিতে রাজি।"
>
> "কোলকাতার বাইরে কিছু জমিজমা এবং জমিদারী ইংরেজদের দিতে হবে। কোন কোন এলাকায় হবে সেগুলো লিখে দেয়া হয়েছে।"

> "আর একটি শর্ত মহামান্য col. Clive, যদি দয়া করে মামুলী ভেট অর্থাৎ personal gift গ্রহণ করেন তাহলে দশ লক্ষ টাকা দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।" (সাঈদ, ২০১২: ১৪৬)

ওমর বেগের কথায় আরো জানা যায় চুক্তির সকল শর্তই মীর জাফর পালন করতে সম্মত যদি ইংরেজ এই যুদ্ধে জয়ী হয় তবে। এই যুদ্ধে তার অবস্থান হবে নিরপেক্ষ দর্শকের। অর্থাৎ তিনি নবাবের সিপাহসালার হয়েও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না আবার ইংরেজের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। যদিও ক্লাইভ-পক্ষ আশা করেছিল মীর জাফর তাদের সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

নাটকের তৃতীয় ও শেষ অঙ্কে রয়েছে পলাশী প্রান্তরকে ঘিরে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত নানা ঘটনা এবং চক্রান্তের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ নবাবের পরাজয় ও ইংরেজের বিজয়। এই অঙ্কে নাট্যকার সংযোজন করেছেন পলাশীর যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ নকশা। নকশাটি যুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তে সকলকে অবগত করানোর জন্য নিয়মানুযায়ী সিপাহসালার মীর জাফর নবাব ও অন্যান্য সেনাপতিদের সম্মুখে পেশ করেন। নবাব সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও গুরুদায়িত্ব। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে নবাব এবং সমগ্র জাতির ভাগ্য জড়িয়ে আছে সে-কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। সকলকে বিদায় দেয়ার পর নবাবের শিবিরে আসেন ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে। তিনি নবাবকে জানান যে যুদ্ধকৌশলের সবকিছুই ঠিক আছে, তবে আক্রমণটা নবাবের পক্ষ থেকেই আগেভাগে হওয়া ভালো। কেননা, নবাবের বাহিনীর শক্তি ইংরেজের চেয়ে অনেকগুণ বেশি এবং আক্রমণ শুরু হলে ইংরেজ সেনাদের প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে পড়বে। সাঁফ্রে আরো জানান যে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজ বিতাড়নের এই যুদ্ধে তিনি সামিল হয়েছেন রাজ্যের লোভে নয়, বরং বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার কিছু পরেই মোহনলাল এসে নবাবের কাছে সংবাদ দেন যে, সাঁফ্রে পরিকল্পনানুযায়ী আক্রমণ শুরু করলেও মীর জাফর ও তাঁর অনুগতরা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। সিরাজ কর্তৃক বারংবার অনুরোধ ও কর্তব্যকাজ স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও মীরজাফর নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পথই বেছে নেন এবং কৌশলে নবাবকে নানা কথার মাঝখানে ব্যস্ত রেখে কালক্ষেপণ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে গুজব রটিয়ে দেন যে নবাব মৃত এবং তিনি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়ে গেছেন। মোহনলাল ও মীরমর্দানের আপ্রাণ চেষ্টা ও আত্মদান সত্ত্বেও এবং সাঁফ্রের একা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরও ইতিহাসখ্যাত এই যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটে। তবে এই যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে ফরাসি সেনা সাঁফ্রের বিশ্লেষণ উঠে এসেছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে। তাঁর মতে,

> "নবাব সাহেব সম্ভবত জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল করে বসেছেন। আপনি আপনার 'ওয়ার' কাউন্সিলের সব সদস্যদের ডাকতে পারতেন। সবার থেকে বুদ্ধি নিতে পারতেন। কেবল কুচক্রীদের কথার ওপর পলাশী বিক্রি করে দিলেন? ...

> আপনার অনভিজ্ঞতার জন্য কড়া মাসুল দিতে হলো। আপনার রাজ্যে কোথায় কি হচ্ছে তার এক সিকিও আপনার জানা নেই। রাজা হতে হলে ইন্দ্রিয়গুলোকে আরো ধারালো করতে হবে। গুপ্তচরের জাল সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। বিশ্বস্ত লোক খুঁজে বের করুন। দুশমন মাথা তোলার আগেই তার মুণ্ড গর্দান থেকে আলাদা করে দিন। আপনি এগুলো কিছুই করেন নি। আপনার স্বজাতিরা আপনার তুষ্টির জন্য আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে যে আপনার রাজ্যে সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আমি সত্য কথা বলার সৎ সাহস রাখি। নবাব হিসেবে আপনি বিতর্কিত, সম্ভবত ব্যর্থ। এক বিরাট চক্রান্তের শিকার হয়েছেন আপনি। (সাঈদ, ২০১২: ১৭২)

এই বিশ্লেষণের অনেক দিকই সত্য হলেও কিছু বিষয় যেমন, রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে সেই খবর নবাব রাখতেন না বলে প্রতীয়মান নয়। তাঁর গুপ্তচরেরও অভাব ছিল না বলে আমরা জানতে পাই ইংরেজদের কথায়। ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য যে কেবল বাণিজ্য নয় এবং এদের বিতাড়নই যে আশু কর্তব্য সেটিও তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বস্ত ও যোগ্য লোকও তিনি খুঁজে বের করেছিলেন; মীরমর্দান, মোহনলাল তারই প্রমাণ। মীরজাফরের বিরাগভাজন তিনি মূলত যে এই কারণেই হয়েছিলেন, নাটকে সেই তথ্যও রয়েছে। সৈনিকদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করে তাদের মধ্যে আনুগত্য ও পেশাদারিত্ব তৈরির পদক্ষেপও ছিল যথোচিত। কিন্তু চক্রান্তকারী ঘসেটি বেগম সৈনিকদের আরো অধিক অর্থ প্রদান করে সৈনিকদের নিজের অনুগত করতে পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। যদিও আমরা দেখি যে নবাব এক পর্যায়ে গৃহশত্রু খালাকে নজরবন্দী করেছেন। এমনকি সিপাহসালার মীর জাফরকে চাকুরিচ্যুতও করেছিলেন, কিন্তু মাতামহীর আদেশ ও অনুরোধে তাকে আবার পুনর্বহাল করেন। তবে শত্রুর প্রতি কঠোর তিনি হতে পারেননি এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর অনভিজ্ঞতা ও কিছুটা আবেগী ভাবনা অবশ্যই তাঁর সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। সবকিছু জেনেও মীরজাফর ও তাঁর দলকে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মূল দায়িত্বের জায়গায় বহাল রাখা ছিল তাঁর সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত। হয়তো তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল শেষ পর্যন্ত মীরজাফর দেশের সঙ্গে বেঈমানি করবে না। তাঁর ভাষায় "মরুভূমিতেও ফুল ফোটে"। মীরজাফরকে তিনি যখন পুরোপুরি চিনতে পেরেছেন তখন ইংরেজের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। তাই সিরাজের শেষ উক্তি,

> সম্ভবত পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার অভ্যাস তাঁর পুরানো। তাই ক্লাইভকে ছলে কৌশলে যুদ্ধে নামিয়েছেন এবং দূর থেকে ইংরেজ আর বাংলার টানাহ্যাঁচড়ার তামাশা দেখছেন তিনি। ক্লাইভ জিতলে নবাব হবেন মীরজাফর এবং আমি জিতলে ফোত হবে ক্লাইভ আর তিনি দেশ ছেড়ে পালাবেন রাতের অন্ধকারে। কিন্তু সিপাহসালার সেটা হচ্ছে না। রণাঙ্গন এখন ক্লাইভের কব্জায়। হাজার চেষ্টা করেও বিদেশীদের মহলের বাইরে আর রাখতে পারবেন না। ওরা ঢুকে পড়েছে এদেশের শ্বাসনালীতে। ওরা বিনা স্বার্থে প্রাণ দেবে না এদেশে। (সাঈদ, ২০১২ : ১৭৪)

তিন.

সাঈদ আহমদ তাঁর এই নাটকে চরিত্রসৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কাল্পনিকতার পরিবর্তে ঐতিহাসিক তথ্য ও গবেষণাকেই ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। ফলে বহুচরিত্রের আনাগোনায় নাটকটির কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেনি। আবার জনপ্রিয়তার প্রলোভনে কোন কাল্পনিক নায়িকা কিংবা বিদূষকও তিনি সৃষ্টি করেননি। চরিত্র পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই তাঁর শিল্পিমানসের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের প্রকৃত মানুষগুলোকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি পোস্টকলোনিয়াল ডিসকোর্সকে অবলম্বন করেছেন। শত শত বছরের পশ্চিমা অপপ্রচারের ধুলো ঝেড়ে তিনি প্রতিটি চরিত্রকেই তার আপন আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের এক চরম মুহূর্তকে শিল্পরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে যে গাম্ভীর্যটুকু থাকা জরুরি তার প্রায় সবটাই তিনি চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক আজাদ রহমান যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে –

> তিনি দীর্ঘ দশ বছরের গবেষণাধর্মী সাধনা শেষে নাটকটির চরিত্র সৃষ্টিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নতুনভাবে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মীরজাফর, ওমর বেগ আর ক্লাইভ চরিত্রও গতানুগতিক নয়, তারাও ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। (সাঈদ, ২০১২ : ৬৪৫)

শামসুর রাহমান এই নাটকের যে পূর্বলেখ রচনা করেছেন সেখানে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন সংযোজন করেছেন এভাবে,

> সাঈদ আহমদ বাংলার শেষ নবাবের চরিত্রের গম্ভীর রূপটি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বস্তভাবে, নাটকের কোনো অংশেই সিরাজদ্দৌলাকে লঘু কিংবা চটুল চিত্তের ব্যক্তি বলে মনে হয় না। ... সাঈদ আহমদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের একজন নতুন সিরাজদ্দৌলা উপহার দিয়েছে। তিনি নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে সচেতন, এই সচেতনতা তাঁকে এটা উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে, যে-নাট্যকার চরিত্রের রূপায়নে শুধু শাদা এবং কেবল কালো রঙ-এর দিকে ঝোঁকেন, এর মাঝখানকার কোনো বর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, উঁচুদরের নাটক রচনায় তিনি সার্থক হতে পারেন না। বুঝি তাই মীরজাফর ও ক্লাইভের চরিত্র আঁকতে গিয়ে শাদা কালো দুটো রংকেই মিশিয়েছেন। সিরাজদ্দৌলাও এর ব্যতিক্রম নন। (সাঈদ, ২০১২ : ৬৪৮)

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা। বিশ বছরের তরুণের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছিল সুবে বাংলার শাসনভার, যা তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল এবং সমকালীন ইঙ্গভূমি থেকে তো অবশ্যই। পূর্ববর্তী নবাব আলীবর্দ্দী খান ছিলেন তাঁর মাতামহ। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর প্রিয় পৌত্র সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেন। কিন্তু মাতামহ

যাকে তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতেন সেই সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনপ্রাপ্তি তাঁর জন্য ভয়ানক দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। শুরু থেকেই খালা ঘসেটি বেগমের তীব্র রোষানলে পড়েন তিনি এবং ধীরে ধীরে লোভী ও কুচক্রী আমির ওমরাহ ও পারিষদবর্গের অসহযোগিতা ও শত্রুতা তাঁর সিংহাসনকে করে তোলে কণ্টকাকীর্ণ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী। বাংলার অর্থ-সম্পদ এবং রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর একচ্ছত্র অধিকারের গভীর-গোপন অভিলাষ অনতিবিলম্বেই তাদেরকে চক্রান্তকারী বিভীষণদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত করে।

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রকল্পনাতে নাট্যকারের বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষণীয়। দেশীয় ও ঔপনিবেশিক শক্তির সকল অপপ্রচারকে খণ্ডন করে তিনি দোষ-গুণসমেত ঐতিহাসিক সিরাজ চরিত্রকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা ও মহিমা দান করেছেন। দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীর দল সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে যেসব অসত্য, বিকৃত ও আংশিক সত্য বক্তব্য প্রচার করে আসছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত নাটক থেকে আমরা উদ্ধার করতে পারি এবং দেখে নিতে পারি, নাট্যকার সেসব অপপ্রচারকে কীভাবে খণ্ডন করে সত্যিকার নবাবকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে অভিযোগ হচ্ছে – তিনি জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভের অনুযোগের জবাবে ভরা মজলিশে তাদের কটুকাটব্য ও গালাগাল করেছেন। অর্থাৎ তরুণ নবাব বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলেন না। তাই তাঁরা নবাবের ওপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু নাট্যসূত্রে জানা যায় রাজবল্লভ হচ্ছেন সেই রাজকর্মচারী যিনি দিনের পর দিন কেবল প্রজাপীড়নের মাধ্যমে তাদের সর্বস্ব লুট করে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়, ঘসেটি বেগমকে যোগান দিয়েছেন মহামূল্যবান মতিঝিল প্রাসাদ নির্মাণের ব্যয় এবং বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন। অন্যদিকে তেজারতের কারবারি জগৎশেঠ বরাবরই উৎকোচ-উপঢৌকনের বিনিময়ে অর্জন করেছেন বিপুল বিত্ত-বৈভব। তাই এসব অত্যাচারী প্রশাসক ও লোভী তেজারতের কারবারিদের প্রতি সিরাজের মতো একজন প্রজাহিতৈষী শাসকের ঘৃণা উদ্রিক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং তাঁর দরবারে এদের কদর থাকার কথাও নয়। সিরাজ বিশ্বাস করতেন, "রাজার কাজ রাজকর্ম পরিচালনা করা। বেকসুর প্রজাদের ধন-দৌলত লুট করা নয়।"

এতৎসত্ত্বেও দীর্ঘদিন ক্ষমতার বলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকা দুষ্ট লোকদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ নবাব হিসেবে সিরাজদ্দৌলার বিচক্ষণতার পরিবর্তে অর্বাচীনতার দিকটিই যে সামনে নিয়ে আসে, নাট্যকার তা প্রচ্ছন্ন রাখেননি। সম্প্রতি সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে লিখিত একটি গবেষণা গ্রন্থেও তাঁর অদূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। গবেষকের মতে, নবাব আলীবর্দী খানও তরুণ সিরাজের স্বভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন –"গুরুভার দায়িত্ব পূর্ণ করার ক্ষমতা সিরাজের নেই এবং তার [কর্কশ] বাক্য দ্বারা সে অন্যায়ভাবে মানুষের মনে আঘাত দেয়। আমার অবর্তমানে কিছুদিনের মধ্যেই সে এ রাজ্য ধ্বংস

করে ফেলবে এবং নিজেকে ধ্বংসকারীদের হাতে তুলে দেবে।" (যাকারিয়া, ২০১৬ : ১৭৩-৭৪)

প্রবীণ সিপাহসালার মীরজাফরও মনে করেন, নবাব তাঁকে পদচ্যুত করে অপমান করেছেন। নিচু বংশের ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উচ্চপদে পদায়ন করে নবাব তাঁকে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট করেছেন। ফলে তিনি প্রতিশোধ নেয়াটাই কর্তব্যকর্ম বিবেচনা করেছেন। একদিকে তিনি নবাবের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করছেন, অন্যদিকে কুচক্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছেন। পলাশীর প্রান্তরে দেশ ও নবাবের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে যে বিশ্বাসঘাতকতার নজির তিনি স্থাপন করেছিলেন তার জবাবে মীরজাফর নবাবকে বলেছিলেন,

> মনে পড়ে নবাব, আপনি আমার নেতৃত্ব ছিনিয়ে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মীরমর্দনকে? মনে পড়ে নবাব, রায়দুর্লভকে বেইজ্জত করে মোহনলালকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন সেই কুরশিতে? মনে পড়ে নবাব, আপনি আপনার খালার ওপর কি নির্যাতন চালিয়েছিলেন? মানীর মান যে রাখতে জানে না তার মান আল্লাহও রাখেন না। আপনার কাছে বংশ আর রক্তের দাম নেই। সাধারণ মানুষকে আপনি মাথায় চড়িয়েছেন। ক'দিন আগে সেপাইদের মাইনে দ্বিগুণ করেছেন। (সাঈদ, ২০১২ : ১৬৪)

মীরজাফরের এসব অভিযোগের জবাবে সিরাজের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় তরুণ শাসকের সাহসী উচ্চারণ:

> আমি সেনাবাহিনীতে বিত্তহীন, মেধাবী সাধারণ ঘরের ছেলেদের সুযোগ দিয়েছি। সারা জীবন সব সুযোগ ভোগ করবে শুধু আমির ওমরাহরা, তা হয় না। (সাঈদ, ২০১২ : ১৬৫)

সেপাইদের বেতন বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "...পেটে না খেলে লুট করবে তাই কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কুচক্রীরা গোটা জিনিসটা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করছে।"

নবাবের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে মীরজাফর বলেছিলেন,"প্রজাদের মধ্যে এমনিই নবাবের নৈতিক চরিত্র নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। আপনার বয়স কাঁচা, মাত্র কিছুদিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। রক্ত গরম, অল্পেই উত্তেজিত হয়ে যান।"(সাঈদ, ২০১২ : ১২৯)

সিরাজদ্দৌলা এই কুৎসার জবাবও দিয়েছেন মীরজাফরকে,

> কথাটা বলে দিয়ে ভালই করেছেন। আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, রাণী ভবানীর দুহিতার সঙ্গে বা নাচনেওয়ালী ফৈজীর ব্যাপারে যে সব খবর শুনেছেন

> সেগুলো ডাহা মিথ্যা। কিছু কিছু সভাসদ এবং ইংরেজ সুহৃদ আমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার জন্য অপবাদ ছড়াচ্ছেন। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৯)

তৃতীয় অঙ্কে সিরাজ যখন মীরজাফরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তখনও মীরজাফর সিরাজকে "ব্যভিচারী নবাব" বলে সম্বোধন করেছিল।

নাটকের অন্যতম এবং একমাত্র নারী চরিত্র ঘসেটি বেগমের অভিযোগ – সিরাজ চক্রান্ত করে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন। কিছুতেই এই অবস্থা মেনে নিতে না পেরে নবাবের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করে ঘসেটি বেগম তাঁর সকল অর্থ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সিরাজকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তবে মীরজাফরের উক্তি অনুযায়ী সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আসীন হবার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র করেননি। বরং অনেক ভেবেচিন্তেই নবাব আলীবর্দ্দী সিরাজকে নির্বাচন করেছিলেন –

> বাংলার মসনদ কণ্টকাকীর্ণ। ওতে বসার জন্য গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন। বেগম সাহেবার নাজুক তবিয়ত। তিনি মার্জিত রুচির অধিকারী। রাজনীতি অনেকাংশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর শঠতার অন্য নাম। তাই বড় নবাব অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তখতের হেফাজত করার জন্য তরুণ সিরাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৩)

অন্যদিকে ইংরেজ বেনিয়ারা সিরাজদ্দৌলার ওপর ক্ষিপ্ত হবার কারণ "নবাব কোলকাতা এসে আমাদের সুরক্ষিত pering point-কে ধুলিস্যাৎ করল। কোলকাতার নাম পাল্টে আলীবর্দ্দীর নামে রাখলো আলীনগর। যদি প্রতিশোধ না নিই তাহলে আগামী বংশধর আমাদের কাপুরুষ বলবে।"[২] সেই সঙ্গে ফরাসিদের সঙ্গে নবাবের সখ্যও ইংরেজদের নবাব-বিরোধিতায় ইন্ধন যোগায়। তাই তারাও সিরাজের শত্রুদের প্রতি মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার জন্য তারাও উঠে পড়ে লাগে। নবাব সম্পর্কে যেসব অপবাদ তারা ছড়িয়েছিল তার মধ্যে "স্বেচ্ছাচারী নবাব", "লম্পট নবাব", "cruel, immoral, sex maniac" এবং "রাষ্ট্র পরিচালনায় সিরাজদ্দৌলা সম্পূর্ণ ব্যর্থ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ক্লাইভের বিভিন্ন উক্তিই আবার এসব অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে। যেমন, নবাবের সঙ্গে আপস রফার প্রসঙ্গে সহকর্মী কুটের প্রশ্নের জবাবে ক্লাইভ বলেছিল, "সে চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি। টাকার লোভ, মেয়ে মানুষের লোভ, মসনদের লোভ, সবই দেখিয়েছি।" (সাঈদ, ২০১২ : ১৩৫)

সিরাজদ্দৌলার উক্তিতেও তার সমর্থন রয়েছে,

> আমি ইংরেজদের চিনি। চাইলে আমিও ইংরেজদের সঙ্গে রফা করতে পারি। অল্প স্বল্প বাণিজ্যিক ফায়দা দিয়ে দিলে ওরা আমার পা চাটতে রাজী। আরাম আয়েশে

> আগামী দিনগুলো কাটাতে পারি। দিল্লীর সুলতান এরই মধ্যে অজস্র টাকা নিয়েছেন আর যাকে তাকে সনদ দিয়েছেন। সেই পথ অনুসরণ করতে আমাকে অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু আমি করব না। করতে পারি না। বাংলাদেশে বিদেশীদের চোখ রাঙানী সহ্য করব না। যদি কেউ ইজ্জত খর্ব করতে চায়, তাহলে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবো। (সাঈদ, ২০১২ : ১৩২)

স্পষ্টত সাঈদ আহমদ সমস্ত অপবাদের জঞ্জাল সরিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাই তাঁর নাটকের সিরাজদ্দৌলা হয়ে উঠেছেন একজন দেশপ্রেমিক, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্ববান শাসক। আত্মীয় ও পারিষদবর্গ যখন একত্র হয়ে তাঁকে সিংহাসন থেকে উৎখাতের চক্রান্তে তৎপর, তখন তিনি তাদের সামনে প্রশ্ন রেখেছেন,

> মসনদে বসার পর থেকে খোদার কসম একদিনও শান্তিতে ঘুমোতে পারিনি। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাদের –এই সিংহাসন কার? আপনার? আমার? এই সিংহাসন এ দেশের কোটি কোটি লোকের আশা এবং নিরাপত্তার প্রতীক। ঐ সিংহাসনকে নিরাপদ করতেই হবে। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৯)

সিরাজের এই উক্তি ইন্দ্রিয়পরবশ আয়েশী ও উচ্ছৃঙ্খল তরুণকে নয় বরং একজন দায়িত্ব ও কর্তব্যসচেতন শাসককেই পাঠকের সামনে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি দায়িত্বপালনে সম্পূর্ণ সচেতন একজন রাষ্ট্রনায়কের উচ্চারণই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে এখানে। ঘসেটি বেগমের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন,

> এই মনোরম মতিঝিল তৈরি হয়েছে পূর্ববঙ্গের লাখো বেগুনাহ লোকদের খাজনা আর লুট করা টাকায়। ...পাপের স্মৃতি হিসেবে মতিঝিল অবশ্যই অনবদ্য। ...আপনার সুরম্য মতিঝিলে শত শত গলাকাটা দেহের জমাট রক্ত লাল পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। ...গরীবের রক্ত শুষে তৈরি করা ইমারতকে ধূলিসাৎ করতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৮)

বস্তুত এসব উক্তি একজন সৎ ও প্রজাহিতৈষী নবাবের পক্ষেই করা সম্ভব।

সর্বোপরি একজন দেশপ্রেমিক সিরাজদ্দৌলাকে প্রত্যক্ষ করা যায় এই নাটকে। যুদ্ধের ময়দানে সিপাহসালার মীরজাফর ও তার অনুগত সেনাপতিরা যখন নবাবের পক্ষে অস্ত্র ধরার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় থেকে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে কেবল তামাশা দেখছিল তখন ভগ্নদূত এসে সিরাজকে সেই খবর দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরকে তলব করেন তাঁর শিবিরে। নবাব বুঝতে পারেন তিনি মীরজাফরকে এই যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে ভুল করেছেন। তিনি মীরজাফরের বিরূপ আচরণের কারণ জানতে চান, এবং পুনর্বার তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেন। দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথের পর সিরাজ

মীরজাফরের প্রাণভিক্ষা দান করেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেন মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যের কথা। শুধু তাই নয়, এ পর্যায়ে আবেগ-ভারাক্রান্ত নবাব একসময়ের গুরু মীরজাফরের পায়ের কাছে স্বীয় পাগড়ি রেখে নতি স্বীকার করেন, তবে তা নিজের প্রাণের জন্য নয়। তিনি বলেন,

> এই মাতৃভূমির খাতিরে, মাতামহকে দেয়া অঙ্গীকারের খাতিরে, ফিরিঙ্গীদের দেশ থেকে দূর করার উদ্দেশ্যে আপনাদের নবাব আপনার কাছ থেকে একটা বিশেষ জিনিস দাবী করছে। ...এদেশের ইজ্জত, বাংলার স্বাধীনতা, কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে কেবল আপনি বাংলার নবাবকে কিছু দিতে পারেন। আপনার কাছ থেকে নবাব দেশপ্রেম চাইছে। (সাঈদ, ২০১২ : ১৬৭)

প্রকৃতপক্ষে এভাবেই সিরাজদ্দৌলা বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকামী জনগণের কাছে হয়ে ওঠেন দেশপ্রেমের গর্বিত 'আইকন'।

এই নাটকে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের প্রকৃত ত্রুটির জায়গাগুলোও নাট্যকার অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং দায়িত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। মূলত অনভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা কিংবা প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার অভাব অনেক ক্ষেত্রে শাসক হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন, মীরজাফর ও রায়দুর্লভকে পদচ্যুত করে মোহনলাল ও মীর মর্দানকে প্রধান সেনাপতির পদে পুনর্নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত সাহসী হলেও রাত পোহাবার আগেই মাতামহীর অনুরোধে কেবল পুরোনো আত্মীয় হবার দোহাই দিয়ে এবং ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে মীর জাফরকে প্রধান সেনাপতি পদে পুনর্বহাল করা নিশ্চয়ই তাঁর দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে না। সর্বোপরি মীরজাফর ও তাঁর অনুগত অনেক সেনাপতিই নবাবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জেনেও এবং বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের পরম মিত্রতার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরকে মূল দায়িত্ব দেয়াটা ছিল চরম অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং ঝুঁকিপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ রাখাটা জরুরি যে নবাব হিসেবে এর আগে তিনি কেবল একটি যুদ্ধই করেছিলেন কোলকাতায়, তা-ও এই ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং তিনি সেখানে জয়ী হয়েছিলেন। বিতাড়িত পরাজিত শক্তি প্রতিশোধস্পৃহায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে লড়তে এসেছে সেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেও তাকে প্রতিহত করতে যথার্থ সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেননি। যুদ্ধের ময়দানে ইংরেজ বাহিনী যখন নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল, মীরমর্দান এবং ফরাসি মিত্র সাঁফ্রের কাছে প্রায় পরাভূত তখন অভিজ্ঞ, চতুর ও কুচক্রী মীরজাফর তার অনুগত সেনাপতিদের নিয়ে নবাবের তাঁবুতে অতিদ্রুত প্রবেশ করে নবাবকে ভুল বুঝিয়ে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত আদায় করে নিয়ে

যায়। এটি ছিল যুদ্ধকালে নেয়া সিরাজদ্দৌলার একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিজয়ী হবার শেষ সুযোগটিও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মোহনলাল এবং সাঁফ্রের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে,

> আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যখন যুদ্ধের মোড় একেবারে ঘুরে যেতে বসেছে, দিশেহারা ইংরেজ সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত, ঠিক এই সময় এই আদেশ কেনো দিলেন আপনি? (সাঈদ, ২০১২ : ১৭১)

> নবাব সাহেব জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল করে বসেছেন। আপনি আপনার 'ওয়ার' কাউন্সিলের সব সদস্যদের ডাকতে পারতেন। সবার থেকে বুদ্ধি নিতে পারতেন। কেবল কুচক্রীদের কথার ওপর পলাশী বিক্রি করে দিলেন? (সাঈদ, ২০১২ : ১৭২)

বলা বাহুল্য, সিরাজের এই অনভিজ্ঞতা ও আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্তের চড়া মাসুল দিতে হয়েছে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিদের, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজেকে এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর রাজ্য ও জনগণকে।

প্রকৃতপক্ষে সিরাজ চরিত্রের একদিকে ছিল তারুণ্যের অমিত শক্তি ও দীপ্তি যা তাঁকে যৌক্তিক ও সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে প্রাণিত করেছে। অন্যদিকে ছিল প্রবল আবেগ ও অভিজ্ঞতার অভাব; যে কারণে যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দ্বিধান্বিত। তাঁর দেশপ্রেম ছিল তর্কাতীত এবং ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন সূর্যপ্রতিম প্রেরণার উৎস। ন্যায়পরায়ণ, প্রজারঞ্জক শাসক সিরাজের কাছে সিংহাসন ক্ষমতার প্রতীক নয়; দেশবাসীর নিরাপত্তার প্রতীক। একদিকে তাঁর ছিল মেধাবী রাজনীতিকের শাণিত বুদ্ধি, অন্যদিকে ছিল বংশগৌরবের যুক্তিহীন সংস্কার। যুক্তি ও যুক্তিহীনতা, সাহস ও সংস্কারাচ্ছন্নতা, বুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার বৈপরীত্যের মিশেলে গড়া সিরাজদ্দৌলা প্রতিকূল সময় ও পরিবেশে আপনজনদের দ্বারা রচিত এক নির্মম চক্রান্তের শিকার।

ক্লাইভ চরিত্র নির্মাণেও আমরা নাট্যকারের বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষ করি। লর্ড ক্লাইভ, ক্লাইভ অব ইন্ডিয়া, মিলিয়নেয়ার ব্যারন ক্লাইভ, মেম্বার অব পার্লামেন্ট ক্লাইভ ইত্যাদি পরিচয়ের বাইরে যে সত্যিকারের রবার্ট ক্লাইভ, তার পরিচয় নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন তাঁর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের বিস্তৃত পরিসরে। রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রটি তার সম্পূর্ণ অতীত উত্তরাধিকার ও চারিত্রিক সকল বৈশিষ্ট্যসহ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে।

ভারতে কোম্পানির নগণ্য চাকুরি নিয়ে আসবার পূর্বে ক্লাইভের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম হয় এবং লন্ডনের বস্তিতে সে বেড়ে ওঠে। লেখাপড়াও তার তেমন ছিল না। কোম্পানি বা সরকারের কোনো উচ্চপদে তার আত্মীয়-স্বজনও তেমন কেউ ছিল না; যাদের সুপারিশে তার কোনো একটা গতি

হতে পারে। বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে সে ফিরে আসে "সেই পুরাতন slum-এ যেখানে মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে ছোকরারা ধুকে ধুকে মরছে।" দারিদ্র্যের কশাঘাতে ভবিষ্যৎ যখন বিপন্ন তখন সে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। মরিয়া হয়ে অবশেষে সে শরণাপন্ন হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে, যেন-তেন একটি চাকুরির প্রত্যাশায়। সেখানে কোম্পানির নিয়োগদানকারী কর্তাব্যক্তিদের কাছে ওপর থেকে তার সম্পর্কে যে সুপারিশ আসে তাতে লেখা ছিল, "বাবার এক সময় কিছু জমিজমা ছিল, কিন্তু বর্তমানে প্রায় নিঃস্ব। লেখাপড়া যৎসামান্য। স্কুল বদলী করতে হয়েছে কয়েক বার। স্বভাব অনেকটা ঝগড়াটে; কথায় কথায় গুন্ডামী। পাড়ায় বখাটেদের শিরোমণি।" (সাঈদ, ২০১২ : ১৪২)

এরকম স্বভাব, পরিবার-পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে উঠে আসা ক্লাইভের কোম্পানির চাকুরি নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করবার দুর্মর বাসনার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছিল সে সম্পর্কে তার বক্তব্য নিম্নরূপ :

> সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নতুন দেশে যেতে চাই, যেখানে হীরা, জহরৎ এলাচি, গোল মরিচ, রেশম আর জাফরানের ক্ষেত আছে। যেখানে অনেক সম্ভাবনা, যেখানে অনেক টাকা, আর শুনেছি অগণিত বেকুব লোকদের বসবাস। একবার কপালটা পরখ করে দেখতে চাই। যদি fail করি তবে সে দেশেই আমার কবর হবে। এখানে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এ শহর আপনাদের মতো বড় লোকদের জন্য। দরিদ্র অল্প শিক্ষিত লোকের জন্য আমেরিকা, ইন্ডিয়া, আফ্রিকা অনেক বেশি suitable. (সাঈদ, ২০১২: ১৪১-৪২)

সাঈদ আহমদ অসাধারণ নৈপুণ্যে স্বল্প কথায় এক বিরাট ইতিহাসকেই ক্লাইভের উক্তির মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন। সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তনের মূলসূত্র ও মৌলভাবনাগুলোই প্রতিধ্বনিত হয়েছে কলোনাইজারদের প্রতিভূ চরিত্র ক্লাইভের উচ্চারণে। এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) গ্রন্থের কথা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে। নাট্যকার সাঈদ আহমদ গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ার সুযোগও হয়েছিল তাঁর। এ-প্রসঙ্গে তাঁর *এডওয়ার্ড সাঈদ : মানবতার কণ্ঠস্বর* শিরোনামে একটি লেখাও রয়েছে, যেখানে তিনি গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন এভাবে –

> বেশ কয়েক বছর আগে আমি সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম' বইটি পড়েছিলাম। বইটিতে পশ্চিমা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর চমৎকার ব্যাখ্যা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঐ বইয়ে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাচ্য সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ওই লেখা প্রাচ্য দেশগুলোকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল। অথচ এ-সভ্যতা সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা হেয় বিবেচিত হয়ে এসেছে। (সাঈদ, ২০১২ : ২৩০)

নাট্যকার তাঁর এই রচনায় নবতর এই পরিপ্রেক্ষিতটি ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালের সাম্রাজ্যবাদ তথা ক্লাসিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজমের জন্ম হয়েছিল অন্যদের সম্পদ লুণ্ঠন, বাজার দখল ও সীমাহীন মুনাফা অর্জন এবং অন্যদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত বাসনা থেকে। প্রথম দিকে তা ইউরোপ-কেন্দ্রিক থাকলেও পরবর্তীকালে সমুদ্রপথে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে তা দূরপ্রসারী হয়ে ওঠে –

> চাকা আবিষ্কার যেমন ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের গতিকে স্বচ্ছন্দ করেছিল, তেমনি বাতাসের গতিপথ আবিষ্কার এবং পালতোলা জাহাজে তার ব্যবহার মানুষের গতিকে সীমাহীন সম্ভাবনার মুখোমুখি করে দিয়েছিল। সমুদ্রে মানুষের স্বচ্ছন্দ বিচরণ শুরুর পর থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের বহু প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। সাম্রাজ্য হতে হলে তা স্থানিকভাবে সংযোজিত ও সম্পর্কিত হতে হবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সহস্র যোজন দূরেও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ইউরো-সাম্রাজ্য। (আমীনুর, ২০১৪ : ১৮৩)

শুরু হয় সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে দেশে দেশে গিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন ও উপনিবেশের পত্তন। ক্লাইভের সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অফুরান সম্পদের বিরাজভূমি সেইসব দেশে যাবার অভিলাষ এক ঐতিহাসিক সত্যকেই সামনে নিয়ে আসে। "আর শুনেছি অগণিত বেকুব লোকদের বসবাস" ক্লাইভের উক্তির এই অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত প্রাচ্যবাদকেই প্রতিধ্বনিত করে।

> Along with all other peoples variously designated as backward, degenerate, uncivilized and retarded, the Orientals were viewed in a framework constructed out of biological determinism and moral-political admonishment. The Oriental was linked thus to elements in Western society (delinquents, the insane, women, the poor) having in common identity best described as lamentably alien. Orientals were rarely seen or looked at; they were seen through, analyzed not as citizens, or even people, but as problems to be solved or confined or –as the colonial powers openly coveted their territory –taken over. (Said, 1979 : 207)

প্রকৃতপক্ষে এভাবেই পশ্চিমারা প্রাচ্যকে সত্যিকার রূপে না দেখে অথবা কখনো দেখতে না চেয়ে পদ্ধতিগতভাবে ভুল প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করে সেই রূপটিই দেখেছে, যা তারা দেখতে চেয়েছে। যার মাধ্যমে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রাচ্যের হীনত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, এডওয়ার্ড সাঈদের গ্রন্থে যা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়ে বেলফোরের মনোভাব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> Still he does speak for them in the sense that what they might have to say, were they to be asked and might they be able to answer,

> would somewhat uselessly confirm what is already evident: that they are a subject race, dominated by a race that knows them and what is good for them better than they could possibly know themselves. Their great moment were in the past; they are useful in the modern world only because the powerful and up-to-date empires have effectively brought them out of the wretchedness of their decline and turned them into rehabilitated residents of productive colonies. (Said, 1979 : 34-35)

বস্তুতপক্ষে প্রাচ্যকে এভাবে উপস্থাপন করার এই প্রবণতা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে বৈধতা দেবার বিশেষ উদ্দেশ্য সংবলিত বলেই প্রতীয়মান হয়। সাদা মানুষ ও প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনা অংশে সাঈদের বিশ্লেষণে এই সত্যতা আরো প্রকটভাবে উঠে আসে –

> Only an Occidental could speak of Orientals, for example, just as it was the White Man who could designate and named the coloreds or non-whites. Every statement made by Orientalists or White Men (who were usually interchangeable) conveyed a sense of irreducible distance separating white from colored, or Occidental from Oriental; moreover beside statement there resonated the tradition of experience, learning and education that kept the Oriental-colored to his position of *object studied by the Occidental-white*, instead of vice-versa. Where one was in a position of power –as Cromer was, for example –the Oriental belonged to the system of rule whose principle was simply to make sure that no Oriental was ever allowed to be independent and rule himself. The premise there was that since the Orientals were ignorant of self-government, they had better be kept that way for their own good. (Said, 1979 : 228)

সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই বণিকের ছদ্মবেশে এসে আফ্রিকা আর ইন্ডিয়ায় তাদের শোষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শত শত বছর ধরে শাসন-নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে এসব অঞ্চলের অগণিত মানুষের ওপর। সেকারণেই বখাটে, স্বল্পশিক্ষিত, মারকুটে, হীন চরিত্রের ভাগ্যান্বেষী এক যুবক রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হিসেবে চাকুরি করতে এসে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী চক্রের সঙ্গে হাত মেলায়, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার স্পর্ধা দেখায় এবং বাংলার মসনদে কালো থাবা বিস্তার করে। সিরাজের মতো একজন দেশপ্রেমিক তারুণ্যদীপ্ত সাহসী শাসককে, বিশেষত বছরপূর্বেই যার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অযোগ্য বলা, প্রকারান্তরে ক্লাইভের সাম্রাজ্যবাদী

নির্লজ্জ চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে। নাট্যকার সাঈদ আহমদ এভাবে ক্লাইভকে যথার্থই একটি প্রতিনিধিত্বশীল কলোনাইজার চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন।

মীরজাফর নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের শিরোমণি তিনি। ইতিহাস-কুখ্যাত, ঘৃণিত ও চিরনিন্দিত এই ব্যক্তিকেও যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করেছেন তিনি এবং তার হঠকারী কর্মকাণ্ডের একটি যৌক্তিক কারণ উদ্ঘাটনে নাট্যকার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

রণকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কূটকৌশলও রপ্ত করেছিলেন প্রবীণ এই সিপাহসালার। তিনি নবাব-পরিবারের আত্মীয় এবং পূর্ববর্তী নবাব আলীবর্দী খানের সময় থেকেই প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা কৈশোরে রণবিদ্যা ও রণকৌশল শিখেছিলেন মীরজাফরের কাছেই। এ-প্রসঙ্গে নাটকের তৃতীয় অঙ্কে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ শিবিরে মীরমর্দানকে সিরাজদ্দৌলা যে উক্তি করেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে,

> আপনারা তো জানেন মীরজাফরকে আমি কত শ্রদ্ধা করি। শৈশবে তাঁর আঙুলের কোমল স্পর্শ আমার কচি মাথার ওপর মেঘের ছায়ার স্নিগ্ধতা দিয়েছে। যুদ্ধের কলা-কৌশল শিখিয়েছেন এবং সর্বোপরি আমার দাদুর মৃত্যু-শয্যা পাশে আমার অভিভাবকত্বের অঙ্গীকার করেছেন। (সাঈদ, ২০১২ : ১৫৩)

কিন্তু মীরজাফরের প্রতি সিরাজের এত গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা থাকলেও সিরাজ সম্পর্কে মীরজাফরের বিচার বিশ্লেষণ ছিল কিছুটা ভিন্ন। নানা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বিস্তর। বিশেষত নবাবের নেয়া কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সিপাহসালারের মোটেই পছন্দ ছিল না। বিশেষত সেপাইদের বেতন বৃদ্ধি এবং মোহনলাল ও মীরমর্দানের মতো অনভিজাত ব্যক্তিদের সেনাবাহিনি ও প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন করা, এমনকি মীরজাফর ও রায়দুর্লভকে পদচ্যুত করে সে-স্থলে তাদেরকে অভিষিক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা, তাতে ঘোর আপত্তি ছিল মীরজাফরের এবং তিনি তাতে অপমানিত, ক্রোধান্বিত এবং প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠেন। ফলে যে ইংরেজ বণিকদের সিরাজদ্দৌলা পছন্দ করতেন না সেই ইংরেজদের সঙ্গে গড়ে ওঠে মীরজাফরের বিশেষ সখ্য।

তবে নাট্যকার আরো গভীরে গিয়ে মীরজাফর চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তরুণ নবাবের কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগই যে তাঁকে হীন ও জঘন্য চক্রান্তে প্রলুব্ধ করেছে তা বলা যায় না, যদিও এসব ঘটনা নিশ্চিতভাবেই আগুনে ঘি ঢালার কাজটি করেছিল। জানা যায়, তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ বাংলার মসনদের প্রতি মীরজাফরের ছিল গোপন অভিলাষ। ক্ষমতার মোহ এবং নবাবের বিরুদ্ধে দ্রোহ করার ইতিহাসও রয়েছে তাঁর। নাটকের প্রথম অঙ্কে ঘসেটি বেগমের প্রাসাদে জড়ো

হওয়া আমীর ওমরাহদের কথোপকথনে উঠে আসে মীরজাফরের অতীত। নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজবল্লভের উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধরণযোগ্য,

> যৌবনে সিপাহসালার তরবারি ধরেছিলেন আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে। যাকে বলে নিছক বিদ্রোহ। যদিও বড় নবাব পরবর্তীকালে তাকে মাফ করে দিয়েছিলেন। সিপাহসালারকে সিংহাসনের ধারে কাছে ঘেষতে দেয়া যে মোটেই নিরাপদ নয় সে ব্যাপারে আলীবর্দ্দী খাঁ মাঝে মাঝেই আমাদের সতর্ক করে দিতেন। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৪)

এই কথার জবাবে মীরজাফর যে উক্তি করেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য,

> সিরাজও একবার বিদ্রোহ করেছিলেন পাটনার রাজাসনের জন্য। আলীবর্দ্দী স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সিরাজকে কাবু করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি আলীবর্দ্দী নিজেও বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁর মুনিব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে। মসনদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। আলমগীর তার বাপকে বন্দী করে রেখেছিলেন কয়েক বছর। হত্যা করেছিলেন ভাইদের। শুনেছি বিলেতের মসনদেও বসার জন্য হত্যাযজ্ঞ চলেছিল। ঘরে বসে কে কখন সিংহাসন পেয়েছে? (সাঈদ, ২০১২: ১২৪)

এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস ফুটে ওঠে এবং একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যায় মীরজাফর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ। তিনি বরাবরই নবাব পরিবারের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিলেন। মাতামহ আলীবর্দ্দী খান তাঁকে নিয়ে কাজ করতে পারলেও তরুণ নবাব সেকাজ ততটা স্বচ্ছন্দে করতে পারেননি। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের গবেষণাতেও তার সাক্ষ্য মেলে–

> গোড়া থেকেই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বাঙলার মসনদ অধিকার করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন।... সেনাবাহিনীর প্রধান বখশি ও প্রধান সেনাপতি হিসেবে মির জাফর সেনাবাহিনির প্রায় সব সেনাপতিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেন এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেন। (যাকারিয়া, ২০১৬ : ১৮০)

ক্লাইভকে লেখা তাঁর চক্রান্তের চিঠি সিরাজের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরকে মূল দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যা ছিল সর্বদিক থেকেই একটি চরম ভুল ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

মীরজাফর ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, নীতিহীন, ক্ষমতালোভী ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক। নিজেকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে সিংহাসনে আসীন করার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতেই তিনি অত্যন্ত কৌশলে সিরাজের সবগুলো শত্রুপক্ষকে নিজের আস্থায় আনেন। গোপনে তিনি ক্লাইভের সঙ্গে চুক্তি করেন; অথচ ক্লাইভের একান্ত প্রত্যাশা ছিল মীরজাফর তাঁর সৈন্যবাহিনি নিয়ে তার পক্ষ হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। কিন্তু সুচতুর মীরজাফর সেই পথে গেলেন না। তিনি কারো পক্ষেই অস্ত্র না

ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন । ইংরেজ যদি যুদ্ধে জিতে তবে তিনি হবেন নবাব এবং ইংরেজরা পাবে তাদের অনুকূল নবাব আর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসি বণিকমুক্ত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার, বিস্তর সরকারি জায়গার মালিকানা ও নগদ অর্থ। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ওমর বেগের কাছ থেকে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে মীরজাফরের এই সিদ্ধান্তের কথা জানার পর ধূর্ত ক্লাইভ একটু ঘাবড়ে গেলেও মীরজাফরের কূটচালের প্রশংসা না করে পারেনি,

> আমাদের option limited এবং মীর সাহেব এই দুর্বল মুহূর্তের ষোলআনা ফায়দা লুটছেন। নেবুর পুরো রস নিংড়ে নিচ্ছেন। What a wonderful statesman! ... একজন নির্ভীক সেপাই-এর দাম অনেক কিন্তু তার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধার অধিকারী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। মীর সাহেবের ক্ষেত্রে দু'টোর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। দুর্দান্ত সিপাহী ও ধূর্ত politician। (সাঈদ, ২০১২ : ১৫১)

যদিও পরবর্তীকালের ইতিহাস হয়েছিল অন্যরকম, যার ভবিষ্যৎবাণী নাটকের শেষ অঙ্কে সিরাজদ্দৌলার সর্বশেষ উক্তিতে পাওয়া যায় –

> মীরজাফর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করল না কেন? ..সম্ভবত পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার অভ্যাস তার পুরানো। তাই ক্লাইভকে ছলে কৌশলে যুদ্ধে নামিয়েছেন এবং দূর থেকে ইংরেজ আর বাংলার টানাহ্যাঁচড়া তামাশা দেখেছেন তিনি। ...কিন্তু সিপাহসালার সেটা হচ্ছে না। রণাঙ্গন এখন ক্লাইভের কব্জায়। হাজার চেষ্টা করেও বিদেশীদের মহলের বাইরে আর রাখতে পারবেন না। ওরা ঢুকে পড়েছে এদেশের শ্বাসনালীতে। ওরা বিনা স্বার্থে প্রাণ দেবে না এদেশে। (সাঈদ, ২০১২ : ১৭৪)

নাটকের একমাত্র নারীচরিত্র ঘসেটি বেগম। নবাব আলীবর্দ্দী খানের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি, প্রকৃত নাম মেহেরুননেসা। নাটকের প্রথম অঙ্কেই কেবল দেখা মেলে নিঃসন্তান, বিধবা, রূপবতী, 'যৌন আবেদনময়ী', মধ্যবয়সী এই নারীর। ঘসেটি বেগমের চরিত্রে মসনদের মোহ এবং অন্ধ, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতাই কেবল নয় তার নৈতিক স্খলনের দিকটিও নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে এবং স্বল্প কথায় তুলে ধরেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে এবং তার স্বগতোক্তিতে উন্মোচিত হয় ইতিহাসনিন্দিত এই নারীর চরিত্রের নানা দিক–

> ...মতিঝিলে একটু হাঁফ ছেড়ে বসতে এসেছি। আনন্দ উৎসব করব। বিশেষ করে ঘসেটি বেগমকে দেখলেই তীর্থের পুণ্যি হবে। কি অদ্ভুত আকর্ষণ মহিলার। ...ঘসেটি বেগমের কথা আর কি বলবো? একাই একশো। স্বামীকে কর আদায়ের তরিকা বোঝাতেন, সেনাপতিকে কামানের গোলা তৈরির মশলা বাতলাতেন। আর অন্দর মহলে ভৈরবীর নতুন নতুন বন্দিশ শোনাতেন। মাঝে মাঝে ভাবি যে, যদি ভগবান বেগম সাহেবাকে পুরুষ বানাতেন তাহলে আমাদের ঘোল না খাইয়ে

> ছাড়তেন না। একেবারে সোজা দিল্লীর মসনদে গিয়ে বসতেন। ...ঘসেটি বেগম বোধ হয় আতর সুরমা লাগাচ্ছেন এখনও। (সাঈদ, ২০১২ : ১১৯)

রাজবল্লভের এই দীর্ঘ উক্তিতে যেমন ঘসেটি বেগমের অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সা, রাজনীতি-সমরকৌশলে দক্ষতা, সংগীতে পারদর্শিতার পরিচয় ফুটে ওঠে তেমনি স্বীয় রূপমাধুরী দিয়ে রাজপুরুষদের মাঝে নিজেকে আকর্ষণীয়া এবং কাঙ্ক্ষিতারূপে উপস্থাপনের নৈপুণ্যে তার নৈতিক চরিত্রের স্খলনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া মঞ্চে ঘসেটি বেগমের প্রবেশ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানেও এই ইঙ্গিত দুর্লক্ষ নয় –

[মাঝ বয়েসী, সুন্দরী ও রুচিসম্পন্ন বেশে সুসজ্জিতা ঘসেটি বেগমের প্রবেশ। চোখের চাহনিতে প্রখরতা আছে আবার যৌন আবেদনও আছে।] (সাঈদ, ২০১২ : ১১৯)

নাটকের প্রথম অঙ্কেই কেবল ঘসেটি বেগম দৃশ্যমান; তবুও চরিত্রের দীপ্তি ও শাণিত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়েই পাঠকের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। সিংহাসনের ওপর নিজের দাবির বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সিরাজদ্দৌলা চক্রান্ত করেই তাঁকে এই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিগুলো স্মরণযোগ্য,

> নবাব আলীবর্দ্দীর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কেবল তিন কন্যা। আমি বড় মেয়ে। তাই আলীবর্দ্দী এবং নওয়াজীশ, দু'পক্ষ থেকেই মসনদে বসবার অধিকার আমার সবচেয়ে বেশি। সেই সিংহাসন থেকে আমাকে চক্রান্ত করে বঞ্চিত করা হয়েছে। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৩)

সিরাজদ্দৌলাকে তিনি বলেছেন,

> চক্রান্ত করে তুমি আমাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছো। যদি বিবেক বলে কোনো জিনিস থাকে তাহলে এখনও সময় আছে সংশোধন কর, প্রায়শ্চিত্ত কর। সিংহাসন থেকে নেমে এসো। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া শরীফ লোকদের কাজ নয়। যদি আমাকে পছন্দ না হয়, তাহলে একরামদ্দৌলার পুত্র মুরাদ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনে বসাও। ওর নামে দেশ চালাবো আমি। যদি আলীবর্দ্দী খাঁর মেয়ের ছেলেদের মধ্যে কাউকে নির্বাচন করতে হয় তাহলে বড় মেয়ের ছেলের অধিকার ছোট মেয়ের ছেলের আগে বিবেচিত হবে। আমি ইনসাফ চাই, করুণা চাই না। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৭)

ঘসেটি বেগমের এসব উক্তিতে দার্ঢ্য থাকলেও এবং যৌক্তিক শোনালেও সূক্ষ্ম বিচারে কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন, নিঃসন্তান ঘসেটি বেগম সিরাজদ্দৌলার ভাই একরামদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন কিন্তু তিনিও বেঁচে ছিলেন না, তাঁর নাবালক পুত্র মুরাদ-উদ-দৌলাকে ঘসেটি বেগম নামমাত্র নবাব বানাতে চান এবং প্রকারান্তরে নিজেই রাজত্ব করতে চান, তবুও সিরাজদ্দৌলাকে নবাব হিসেবে মানতে

রাজি নন তিনি। ঘসেটি বেগমের উদ্দেশে মীরজাফর যে উক্তিটি করেছিলেন তাতে উদ্ঘাটিত হয় প্রকৃত কারণ,

> মনে রাখবেন আপনার মরহুম দত্তক পুত্র একরামদ্দৌলার ছেলে মুরাদের দাবীও বিবেচিত হয়েছিল। নাবালক রাজ্য চালাতে পারে না। আপনাকে Regent অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হতো। দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচক্ষণ বড় নবাব আপনার ছোট বোন আমেনা বেগমের উপযুক্ত ছেলে সিরাজদ্দৌলাকে নির্বাচন করলেন। ...কিছুটা যে পক্ষপাতিত্ব হয়নি সেটা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৪)

সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের মধ্যে যারা ঘসেটি বেগমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তারা প্রকৃতপক্ষে ঘসেটি বেগম নারী বলে তাকে মসনদে বসাতে আগ্রহী ছিল না; যদিও ঘসেটি বেগমের প্রতি তাদের তথাকথিত সহানুভূতি দেখা যায়। কিন্তু ঘসেটি বেগম নারী বলে নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে নারাজ। নিজের দাবির পক্ষে তাঁর দৃঢ় ও অকাট্য যুক্তি –

> আমি মহিলা বলে আমার কি মসনদে বসার অধিকার নেই? বিদ্যা, বুদ্ধি, রণকৌশল কোন দিক দিয়ে আমি আপনাদের চেয়ে কম? ভালো করেই জানেন, এই মুর্শিদাবাদে আমাকে হারাতে পারে এমন মেধাবী ব্যক্তি কেউ নেই। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৩)

ক্ষমতা ও মসনদকেন্দ্রিক রাজনীতির অন্ধকার, নৃশংস-নিষ্ঠুর দিক, ন্যায়-অন্যায়বোধ, নীতি-নৈতিকতার বিচার সম্পর্কে ঘসেটি বেগমের বিবেচনা ছিল সিরাজদ্দৌলার চেয়ে আলাদা। তাঁর বিবেচনায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। তাই ন্যায্য অধিকার আদায়ে তিনি যে পথ বেছে নিয়েছেন তা কতটা ন্যায়সঙ্গত সেটি ভেবে দেখেননি। বরং তিনি খুব স্বচ্ছন্দেই সিরাজদ্দৌলার শত্রুদের নিজ প্রাসাদে ডেকে তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছেন, সিরাজের সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের নবাবের প্রদেয় বেতন-ভাতার চাইতেও অধিক টাকা দিয়ে তাদেরকে নিজের অনুগত করতে এবং নবাবের প্রতি অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছেন। এমন কি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন। আবার অন্যদিকে দিল্লির বাদশাকে অজস্র টাকা ও স্বর্ণমুদ্রা নজরানা দিয়ে শওকত জঙ্গকে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থাও করেছেন সিরাজকে উৎখাতের প্রয়োজনে। ঘসেটি বেগমের প্রাসঙ্গিক একটি উক্তি উদ্ধরণ করা যেতে পারে,

> দিল্লীশ্বর, তিনি তো কেবল টাকা বোঝেন। টাকা ঢাললে যা ইচ্ছে লিখিয়ে নিতে পারেন। ঘুষ বলা যায় না। কারণ এ টাকার সঙ্গে বংশ, রক্ত, রাজত্ব অনেক কিছু জড়িত আছে। (সাঈদ, ২০১২ : ১২২)

ঘসেটি বেগমের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ সম্পর্কে সিরাজদ্দৌলা যখন বলেন "এই মনোরম মতিঝিল তৈরি হয়েছে পূর্ববঙ্গের লাখো বেগুনাহ লোকদের খাজনা আর

লুটকরা টাকায়।" কিংবা "পাপের স্মৃতি হিসেবে মতিঝিল অবশ্যই অনবদ্য।" তার উত্তরে ঘসেটি বেগমের উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

> নবাব তোমার জানা উচিত যে, রাজ্য গড়তে হলে রাজার মতো আচরণ করতে হয়। রাজ-ন্যায় সাধারণ ন্যায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটো দু-ওজনের। আমাদের বীর্য, বুদ্ধি অনেক উঁচু মানের। আমাদের কথাবার্তা, চাল-চলন সাধারণ মানুষের মতো নয়। আমরা যা করি সেটা সাধারণ প্রজারা ভাবতে পারে না এবং তারা যা করে সেটা আমাদের প্রাসাদে অচল। ...কোন রাজপ্রাসাদ পরের ধন ছাড়া তৈরি হয়েছে? দিল্লীর বড় বড় কেল্লার জন্য পয়সা এসেছে সুদূর বাঙ্গাল আর পার্বত্য দাক্ষিণাত্য থেকে। কারিগর এসেছে ইরান, তুরান থেকে। সবই লুটের মাল। (সাঈদ, ২০১২ : ১২৮)

এসব উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঘসেটি বেগমের যে স্বরূপ উন্মোচিত হয় তাতে তাকে আত্মসচেতন, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, পাষাণপুরীর চারদেয়ালে আবদ্ধ এক প্রজাবিচ্ছিন্ন জনস্বার্থবিরোধী ক্ষমতা ও অর্থলোলুপ স্বার্থপর নারী বলা যায়।

অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মোহনলাল, মীরমর্দান, কুট, কিলপ্যাট্রিক, ওমর বেগ প্রমুখ। প্রথমোক্ত তিনজন সিরাজের বিরুদ্ধে এবং মীরজাফরের অনুগত ছিল, দ্বিতীয় দুজন শেষ পর্যন্ত সিরাজের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিল; পরবর্তী দুজন ক্লাইভের সহচর এবং শেষোক্তজন মীরজাফরের একান্ত আস্থাভাজন দূত। এদের প্রত্যেকের উপস্থিতি, আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাটকের পট-পরিবেশ হয়ে উঠেছে বিশ্বাসযোগ্য।

চার.

ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার উপনিবেশিত হওয়ার প্রাক্কালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রচিত আলোচ্য নাটকটিতে পশ্চিমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত ইতিহাসের একটি পাল্টা উদ্ঘাটন এখানে মুখ্য বিষয় হিসেবে এসেছে। সেই সঙ্গে নাটকটির রচনাকাল বিবেচনা করলে সমকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের টালমাটাল রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি প্রচ্ছন্ন ছায়াপাতও লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকে নাট্যকারের গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সমাজ যখন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যায়, পরিজন যখন দুর্জনের ভূমিকা গ্রহণ করে, আস্থাভাজন দায়িত্বপ্রাপ্তরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সর্বোপরি অর্থ ও ক্ষমতার মোহ যখন তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারা মেতে ওঠে ভয়ঙ্কর সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বোনায় তখন একা একজন দেশপ্রেমিক ও প্রজাবৎসল শাসক যে কী চরম অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয় তা সিরাজ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। নাটকটি সম্পর্কে নির্দেশক খ ম হারুন যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য,

> আমার কাছে নাটকটি ঐতিহাসিক তবে একই সঙ্গে আধুনিক। 'শেষ নবাব' এর বক্তব্য স্পষ্ট ও গভীর এবং তা সমকালকে স্পর্শ করে। পলাশীতে নবাব হেরে গেছেন বটে কিন্তু তাঁর বীরত্ব, স্বাধীনতা চেতনা, মর্যাদাবোধ হারেনি। নাটকে যে যুদ্ধ তা উপলব্ধির, সচেতনতার এবং সর্বোপরি তা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। (সাঈদ, ২০১২ : ৬৫১)

সাঈদ আহমদের সংযম ও পরিমিতিবোধ নাটকটিকে দিয়েছে বাহুল্য ও শৈথিল্যবিবর্জিত একটি টানটান নির্মিতির সৌষ্ঠব। তিনটি অঙ্কে দৃশ্যবিভাজনহীন এই নাটকে চরিত্রগুলো এসেছে ঘটনা ও ক্রিয়ার অনিবার্যতায়ট। স্বগতোক্তি (soliloquy), ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ একদিকে যেমন রচনা করেছে বিশ্লেষণী ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত রসগর্ভ সংলাপ নাটকটিতে একটি দরবারি ও অভিজাত শ্রেণির রুচিবোধ তুলে ধরেছে যথার্থভাবে। সর্বোপরি এই নাটকে তৎকালীন বাংলাদেশের উপনিবেশের কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশের প্রাক্কালের ঘটনাসমূহ তুলে ধরতে নাট্যকারের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ তথ্য এবং নবতর দৃষ্টিকোণ পাঠক ও দর্শককে নিশ্চিতভাবেই দান করেছে ইতিহাসের নতুনপাঠের আস্বাদ এবং গ্লানিমোচনের তৃপ্তি। একই সঙ্গে পাঠক-দর্শকচিত্ত আর্দ্র হয় শেষ স্বাধীন নবাবের প্রতি সহানুভূতিতে আর সত্তাবোধের উজ্জীবন ঘটে মহিমাময় দেশপ্রেমে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (২০১৬)। *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা,* প্রথমা, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা

আমীনুর রহমান (২০১৪)। *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্ব* সম্পা. বেগম আকতার কামাল, অবসর, ঢাকা

সাঈদ আহমদ (২০১২)। *সাঈদ আহমদ রচনাবলি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Edward W. Said (1979). *Orientalism*, Vintage Books, NewYork